৫৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

মধুদা-জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি নাম

সুমন মাহমুদ ঃ মধুদা একটি নাম, একটি ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মধুর কেন্টিনের স্বত্বাধিকারী। মধুদার নাম জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে বিভিন্ন কারণে। পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতি–রাজনীতি যা কিছুই চর্চা হতো অতীতের দিনে তার কেন্দ্রস্থল বা আড্ডার স্থান ছিল মধুর কেন্টিন। স্বাধিকার অর্জনের বিভিন্ন আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখান থেকে। একাত্তরের ২৫ মার্চ স্ত্রী–পুত্র–পুত্রবধূসহ নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই কেবল নয়, জাতির ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে আছেন। শনিবার বিকালে তাঁর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব গুণীজনের আগমন ঘটেছিল। শিক্ষাজীবনের তাদের সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে তিনি ছিলেন নির্ভরতার প্রতীক, অনুপ্রেরণার সঙ্গী। মধুদা ভালবাসা দিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝে মধু ছড়িয়েছেন, শৃঙ্খল–মুক্ত দেশ গঠনের সাহস দিয়েছেন নীরবে নিভৃতে অনেককেই।

সর্বজনের কাছে মধুদা নামে পরিচিত হলেও তাঁর পোশাকী নাম মধুসূদন দে। তাঁর পিতা আদিত্য চন্দ্র দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাকাল থেকে কলা ভবনের কাছে চায়ের দোকান চালাতেন। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আদি কলাভবনের সীমানার মধ্যে মধু দা নিজের কেন্টিন চালানো শুরু করেন। পরে ষাটের দশকের মধ্যভাগে নতুন কলাভবন নির্মিত হলে মধুর কেন্টিনও স্থানান্তরিত হয় তার সংলগ্ন এলাকায়। ঘরটা ছিল শাহবাগে স্থাপিত নবাবদের নাচঘর। নূপুরের নিক্কণ থেমে গিয়েছিল, রঙ্গিন জানালার বাহারী রূপ ভেঙ্গে নতুনের কলধ্বনিতে পরিণত হলো কেন্টিনে– নাম তার মধুর রেস্তোরাঁ। এই রেস্তোরাঁর চায়ের খ্যাতি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। চা ও খাবারের উপকরণ সামান্য থাকলেও মধুদা শত অভাবের মধ্যে এই কেন্টিনটি চালু রেখেছিলেন। একে ঘিরে ছিল ছাত্র–ছাত্রীদের প্রাণবন্ত জীবন। ১৯৪৮, ১৯৫২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯–এর গণ অভ্যুত্থান সবকিছুর সূচনা পর্ব ছিল ঐ কেন্টিন। ১৯৭১ সালের কলাভবন চত্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে চূড়ান্ত শলাপরামর্শ করেছিলেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ কেন্টিনে বসে।

মধুর কেন্টিনকে এদেশে ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার বলা চলে। দেশে এমন অনেকে আছেন, যাদের ঐ কেন্টিনে বাকীর খাতায় নাম রয়েছে। মধুর দোকানে বাকী খাওয়া ছাত্রদের পক্ষে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায়। ছাত্ররা খেয়ে চলে যেতেন, বন্ধুদের আপ্যায়ন করে বিদায় নিতেন। এক সময়ে দেখা গেল বিরাট বাকীর অঙ্ক। আজ যারা দেশের শীর্ষ পর্যায়ে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এমন অনেকে আছেন ঐ বাকীর তালিকায়। গতকাল আলোচনায় বক্তারা নিজেদের বাকীর কথাটি সজ্ঞানে বলেছেন। সেই অসাধারণ ব্যক্তি মধুদাকে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিতে হবে তাই ওরা প্রথম লক্ষ্যবস্তু করেছিল মধুদা ও মধুর কেন্টিন। ওরা তাঁর বড় ছেলে রনজিৎকুমার দে, পুত্রবধূ রিনা রাণী দে এবং মধুদার সহধর্মিনী যোগমায়া দেকেও একসঙ্গে হত্যা করে। এখন বেঁচে আছেন মধু'দার

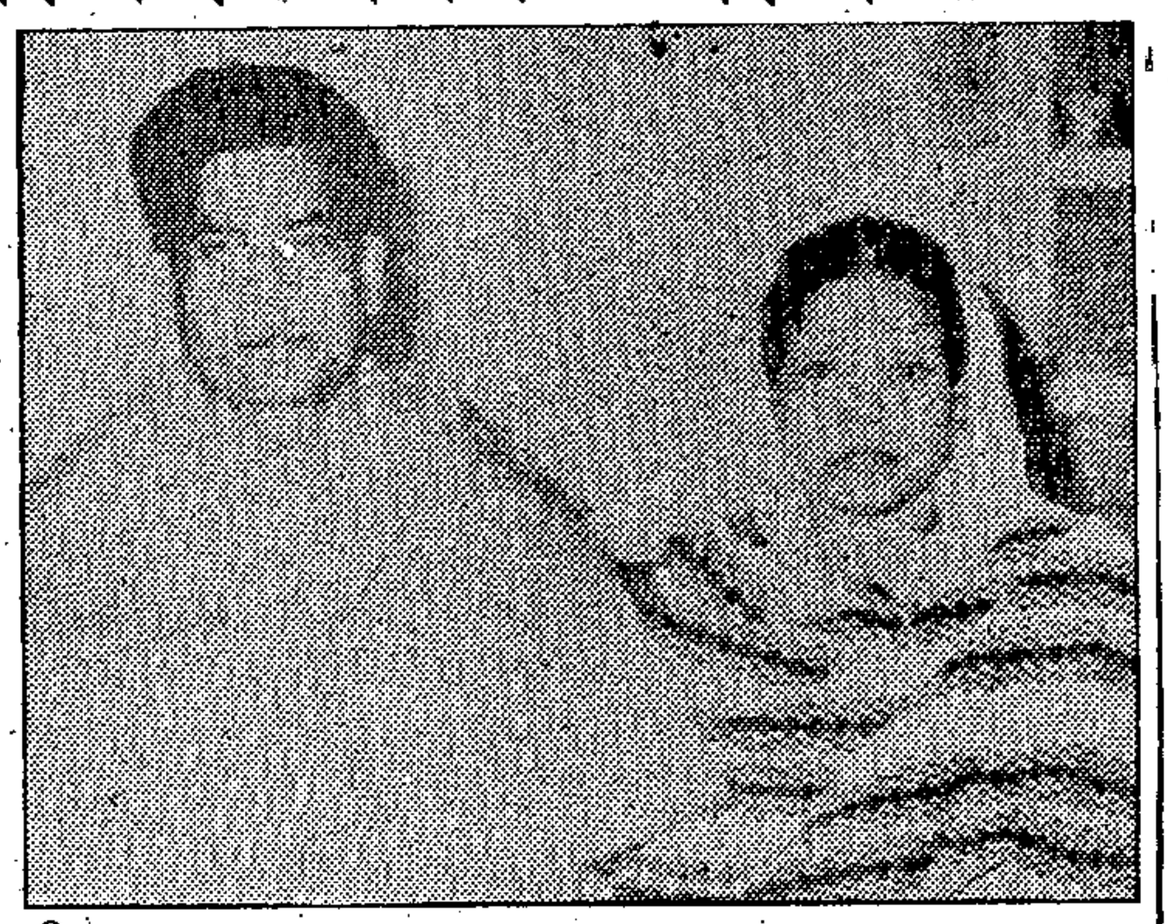

স্ত্রী যোগমায়া দে–এর সঙ্গে মধুদা

ছেলে বাবুল চন্দ্র দে। তিনি মধু'র কেন্টিনটি পরিচালনা করছেন।

মধুদা'র জন্ম ১৯১৯ সালের এপ্রিলে। মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের বাবুর দিঘীরপাড় গ্রামে তাঁর শিশুকাল কেটেছে। বিশের দশকে তিনি ঢাকা আসেন। বাবা আদিত্য চন্দ্র দের সান্নিধ্যে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় বড় হয়েছেন। একজন মহৎ অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি।

জাতীয় যাদুঘর শিশু মিলনায়তনে 'মধুদা' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, খান শামসুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বহু বরেণ্য রাজ-

স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

নীতিক, শিল্পী সাহিত্যিক গুণীজন এসেছিলেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় মধুদা'কে শ্রদ্ধা জানাতে। বক্তাদের আলোচনার সময় দর্শক শ্রোতার আসনে বসা সব বরেণ্য গুণী ব্যক্তিরা সেই পুরনো ইতিহাসের স্মৃতি স্মরণ করছিলেন। অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ মধুদা'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ভালোবাসার গুণে ছাত্র–ছাত্রীদের মনে নিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কাছে সব ছাত্র–ছাত্রী ছিল সমান। তিনি সমাজের মিলিত মনের প্রতীক ছিলেন। খান শামসুর রহমান বলেন, মধুদা একটি নামই নয়, একটি প্রতিষ্ঠান। মুক্তবুদ্ধি, সচেতন প্রগতিশীল ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি তার ভীষণ ভালবাসা ছিল। যারা দেশের স্বাধিকারের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক তাদের অপছন্দ করতেন তিনি। ওদের প্রতি তার মুখে কালো ভাব ফুটে ওঠতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী মধুদা'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, মধুদা'র মধুর কেন্টিন একটি ইতিহাসের নাম। বাংলাদেশের সব কয়টি আন্দোলনের তথা পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই কেন্টিন থেকে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আজ রাজনীতিতে আদর্শ নেই। আছে শুধু প্রাপ্তির রাজনীতি। টাকা দিয়ে রাজনীতি চলে। আদর্শ মূল্যবোধ ও উন্নত চেতনা সব যেন হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারপরও আশার কথা এত অবক্ষয়ের মধ্যে এখনো কেবল মধুর কেন্টিনে সবাই দলমত নির্বিশেষে একসঙ্গে বসে কথা বলেন, চা খান। এরকম ঐক্যবদ্ধ সহমর্মিতা যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায় ও জাতীয় রাজনীতিতে সম্প্রসারিত করা যায় তবে দেশে আদর্শের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, অস্থিরতা দূর হবে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক ঐ সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ উনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা বর্ণনা করে বলেন, এ সময়ের সব আন্দোলনের যাত্রা হতো মধুর কেন্টিন থেকে। ঐতিহাসিক ১১ দফা প্রণয়নের পর ঐ কেন্টিনে সাংবাদিক সম্মেলন করে আমরা জাতিকে তা জানিয়ে ছিলাম। আমাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য ছিল কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল মঞ্চ পর্যন্ত। মঞ্চ থেকে নেমে মধুর কেন্টিনে বসে আমরা কথা বলতাম একে অপরের সঙ্গে। তিনি মধুদা'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের লাঠি চার্জ, গুলিতে ছাত্র–ছাত্রীরা আহত হয়ে এই মধুর কেন্টিনে আশ্রয় নিত, চিকিৎসা পেতো। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলায় বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে জড়ানোর পরে এই কেন্টিন থেকে প্রথম শ্লোগান উঠলো আমরা আজ শপথ নিলাম, মুজিব তোমায় মুক্ত করবো।' '৬৯–এর ২২ ফেব্রুয়ারী মুক্ত হয়েছিলেন মুজিব। অবিসংবাদিত নেতাকে আমরা বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজ নির্বাচনে পরাজিত শক্তি স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে এক হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তিনি এদেরকে প্রতিরোধে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। লেখক বুদ্ধিজীবী সমাজকে সোচ্চার হবার অনুরোধ জানান। ৪৪৩ পৃষ্ঠার মধুদা গ্রন্থটিতে বহু বরেণ্য ব্যক্তি লিখেছেন। মধুদা স্মৃতি সংসদ বইটি প্রকাশ করেছে।